Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 123 – 128
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

গুণময় মান্নার উপন্যাস 'জননী' একটি পর্যালোচনা

পাপ্পুসোনা গান্ধী
সহকারি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, মিরাণ্ডা হাউস কলেজ, নিউ দিল্লী
ইমেইল : professorpsgandhi@gmail.com

Keyword
খাদ্য সংকট, কন্ট্রোলব্যবস্থা, পুলিশ পেট্রল, কালোবাজারি, মন্বন্তর, নৈরাশ্যজনক স্বাধীনতা, ধ্বস্ত ও অপচয়িত মানবজীবন।

Abstract
স্বাধীনতা-উত্তরকালের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক গুণময় মান্নার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'জননী' (আষাঢ় ১৩৬২)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে দালাল ও ফড়েদের নিয়ে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা অল্প পরিশ্রমেই অনেক বেশি অর্থ উপার্জনে তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং এই নবোদ্ভূত শ্রেণীর হাত ধরে এ দেশে 'কালোবাজারি' নামে একটি নতুন বিষয়ের সূত্রপাত হল যা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যে সমস্ত কারণে বাঙালী তথা ভারতবাসীর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেছিল তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই উদ্ভূত চরম খাদ্যসংকট। কিছু অর্থগ্রিধ্ন মানুষের ষড়যন্ত্রে এবং কূট প্রশাসনিক মদতে শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বাংলার বুকেও কিভাবে এই কৃত্রিম সংকট তৈরি হল, চরম দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে পড়ে চাষী-মজুর-কামার-কুমোর-রাজমিস্ত্রি আপামোর খেটে খাওয়া মানুষ কি ভাবে পেটের দায়ে ধান-চাল চালানের কাজে তৎপর হয়ে উঠল, কিভাবে সহজ সরল অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল একদল ধান্দাবাজ স্বার্থপর মানুষ, কিছু সুযোগসন্ধানি প্রশাসকের অসহযোগিতায় কিভাবে পেট্রল লিডার পবিত্র সেনের মতো একজন সৎ ও দক্ষ সরকারি অফিসারের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল -- এই সব জটিল কুটিল বিষয় অতি সুনিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে।

এছাড়াও জনৈক বিধবা যুবতি মুকুলের জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকি হয়ে পড়া মানুষের অস্তিত্বের সংকটকেও চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ উপন্যাসে যা এ উপন্যাসে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

উপন্যাসে বর্ণিত এই সব বিষয়ের পাশাপাশি এই উপন্যাসের আলোকে ঔপন্যাসিক গুণময় মান্নার জীবনদর্শনকে ব্যক্ত করা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

Discussion

স্বাধীনোত্তর বাংলা সাহিত্য বলতেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, অবৈধ অনুপ্রবেশ কিংবা ভয়াবহ উদ্বাস্তুসমস্যা নিয়ে লেখা সাহিত্যের কথা; তবে এই কালপর্বের আরও একটি অন্ধকার দিক ছিল যা তেমনভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থান পায়নি। এই সময় খাদ্যসংকট মোকাবিলায় প্রবর্তিত কন্ট্রোলব্যবস্থাকে আশ্রয় করে যে এক বিরাট দুর্নীতিচক্র গড়ে উঠেছিল তা অধিকাংশ সমসাময়িক সাহিত্যিকদেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। গুণময় মান্নার তৃতীয় উপন্যাস 'জননী' (১৯৫৫) এই উপেক্ষিত বিষয়টির ওপরই আধারিত। আসলে গুণময় গতানুগতিক ধারায় সাহিত্য রচনা না করে আজীবনই নিভৃতভাবে সাহিত্য রচনায় ব্রতী থেকেছেন। সমসাময়িক দেশ ও কালের নানান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর মেলে তার রচিত গল্প উপন্যাসে। তাঁর সেই সব বক্তব্য আর পাঁচ জন মানুষের থেকে আলাদা বলেই হয়তো তাঁর রচনা তেমনভাবে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়নি। তিনি সব সময়ই ঘটনার ভেতরের ঘটনাকে, রাজনীতির ভেতরের রাজনীতিকে তুলে ধরে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নানান সরকারী প্রকল্প তথা সিদ্ধান্তের অসারতার দিকটিকে তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আলোচ্য 'জননী' উপন্যাসটিতে তিনি আমাদের এমন এক প্রতিবেশে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন যা আমাদের যুগপত বিস্মিত ও চমকিত করে আমাদের মনে ভাবনার এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেয়।

আমরা এ কথা সকলেই জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে যে চরম খাদ্যসংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তার জের স্বাধীনতার পরও অব্যাহত ছিল এবং এই সংকটের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে ছিল অত্যন্ত বেশি। এই সংকট অনেকাংশেই ছিল কৃত্রিম তথা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের আখের গোছানোর জন্য এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। শুধু যে স্বার্থান্বেষী সাধারণ মানুষই এর সাথে যুক্ত ছিল তা নয়, সরকারের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নেতা-মন্ত্রীরা পর্যন্ত সকলেই এই ষড়যন্ত্রের সামিল ছিলেন। ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না নির্মোহ দৃষ্টিতে এই জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রের নগ্ন ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'জননী' উপন্যাসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই দুর্নীতির সূত্রপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালোবাজারি, আড়তদারি প্রভৃতি কারণে একদিকে যেমন ভয়াবহ দারিদ্র্যের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তেমনই আবার অপরদিকে অপরিমেয় সম্পদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। বস্তুত, এই ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্যের প্রক্রিয়াটি যাতে সুচারু ভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে জন্যই সরকারের তরফ থেকে কন্ট্রোলব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল; কেন না, কোনো বিষয়ের ওপর ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে পুরো বিষয়টিই নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন,

> "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে অসহ্য দারিদ্র্য আর অপরিমেয় সম্পদ পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে। এই বৈপরীত্য একই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। যদি প্রক্রিয়াটিকে অব্যাহতভাবে চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বৈপরীত্য এমন এক পর্যায়ে আসে যখন প্রক্রিয়াটিই বিনষ্ট হয়। সুতরাং প্রক্রিয়াটির যাঁহারা পোষক তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বসাইলেন কন্ট্রোল।"[১]

স্বাধীনতার পরও পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত সরকার খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে কন্ট্রোলব্যবস্থা জারি রাখে। তবে সব ক্রিয়ারই একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। মানুষের নিজের রুটিরুজিতে টান পড়তেই কন্ট্রোলব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে লাগল দুর্নীতি; আর সেই দুর্নীতিরোধকল্পে তৈরী হল দুর্নীতিরোধী আইন; কারণ,

> "দুর্নীতিও কি অব্যাহতভাবে চলিতে দেওয়া যায়? তাহাতেও বিপদ। সাপুড়েকেও সাপে কামড়াইয়া থাকে। ... ইহা এমন এক পিরামিড অঙ্কের ভাষায় যাহা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।"[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরের বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত একদিকে যেমন কন্ট্রোলব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাপকহারে ধান চাল চালান হয়ে যেতে থাকে তেমনই আবার অপরদিকে এই সব চালানি কারবার বন্ধ করে উদ্বৃত্ত ধান মজুত করার জন্য সরকার বিভিন্ন স্থানে পেট্রল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে কর্ডন বসায়।

মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণকারী ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল হিসেবে নির্বাচিত করে নিয়েছেন মেদিনীপুর জেলারই দুধকামরা নামক একটি গ্রামকে। সেই সময় এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ধান চালান দেওয়ার কারবারে জড়িয়ে পড়ে। শ্যামসুন্দর সামন্ত এই গ্রামের ধান চালানের কারবারের পান্ডা তথা বন্দকি কারবারি।

এর অধীনেই খেটে-খাওয়া অভাবি মানুষের দল কাঁচা টাকার লোভে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধান চালানের কাজে নিযুক্ত হয়। এদের কাজ ছিল স্থানীয় চটিসমূহ থেকে ধান কিনে চড়া দামে মহাজনি নৌকায় বোঝাই করে সেই সব ধান পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলায় চালান করা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই ধান চালানের কাজে যুক্ত থাকলেও এবং ঐ দুধকামরা অঞ্চলে ধানচালানের একাধিক বড় ব্যবসায়ী থাকলেও শ্যামসুন্দরই এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। পুলিশ থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই তার হাতের মুঠোয়। জনৈক মন্ত্রী তার সাহায্যেই নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ায় মন্ত্রী শ্যামসুন্দরের প্রতি সবিশেষ প্রসন্ন এবং এই মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় থেকে প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্যামসুন্দর অবলিলায় তার দু নম্বরি কারবার চালাতে থাকে। সে স্থানীয় চাষীদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করে তার খামারে মজুত করে রাখতে থাকে এবং রাতের অন্ধকারে বড় বড় মহাজনি নৌকায় বোঝাই করে কুইন্ট্যাল কুইন্ট্যাল ধান বাইরে চালান করে দেয়। এদিকে ঐ অঞ্চলে নবনিযুক্ত জনৈক সৎ পুলিশ অফিসার, ত্রিশ বছর বয়স্ক, সুঠাম যুবক পবিত্র সেন ধান চালান রুখতে কড়া পাহারা বসালে শ্যামসুন্দরসহ স্থানীয় চালানি কারবারিদের সাথে তার প্রবল সংঘর্ষের সূচনা হয়। শ্যামসুন্দর মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে পবিত্র সেনকে বশ করতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। শ্যামসুন্দরের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে ধান চালান আটকানোর জন্য পেট্রল অফিসার পবিত্র সেন তার নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে নিয়ে 'জলপুষ্পক' নামক একটি ছোট পান্সিতে করে সারা রাত ধরে জেগে পাহারা দিতে থাকে। ক্রুদ্ধ শ্যামসুন্দর বলে,

> "সাবাস। আপনি একেবারে খাঁটি মাল মশাই। আপনাদের জন্যই দেশটা এখনও টিকে আছে।"[৩]

এক দিন মধ্যরাতে শ্যামসুন্দর পুরুষবেশে ও তার প্রধান সাগ্রেদ হিরালাল স্ত্রীর ছদ্মবেশে একটি প্রকাণ্ড মহাজনি নৌকায় বোঝাই করে এক শ' মণ ধান চালান দিতে গেলে পবিত্র তা ধরে ফেলে। আরও এক দিন শ্যামসুন্দরের পরিকল্পনা ছিল যে, সে তার বাড়িতে নির্বাচনের জন্য প্রচার করতে আসা জনৈক মন্ত্রীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে সেই রাতে নিজের গোলা ভরা মজুত করা ধান বাইরে চালান করে দেবে; পবিত্র সেই রাতেও তার বাড়ি ঘেরাও করে সব ধান আটক করে নেয়। এতে অবশ্য শ্যামসুন্দরসহ মন্ত্রীও জারপরনায় পবিত্রের ওপর অসন্তুষ্ট হয়; কেন না, মন্ত্রী যার বাড়িতে আশ্রিত সে নিজেই দু নম্বরি কারবারে যুক্ত এটা সবার কাছে সরাসরি প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় তার আপত্তি।

পবিত্র যে শুধু শ্যামসুন্দরদের মতো বড় বড় ব্যবসায়ীর ওপরই নজর রেখেছিল তা নয়, সমগ্র এলাকার ওপরই তার কড়া নজর ছিল। ঐ অঞ্চলে গোপিগঞ্জ ও রাণীচক ধান চালানের আরও দুটি প্রধান ঘাঁটি। গোপিগঞ্জও রাণীচকের হাটে প্রচুর পরিমাণ ধান এনে মজুত করা হয় চালান দেওয়ার জন্য। এই সব ধান চালান বন্ধ করতেও পবিত্র তৎপর হয়। রাণিচকের হাটে বেআইনি ধানের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পবিত্র তার ঊর্ধ্বতন অফিসার সুরেশবাবুকে যথাসময়ে ফোর্স নিয়ে আসতে বললেও সুরেশ আসে না। সুরেশ পোদ্দার পবিত্রকে সাফ জানিয়ে দেয় যে চালানিদের চোখ রাঙানি, নেতাদের যোগসাযুস ও শাসকদের দুরবিসন্ধি এড়িয়ে তার একার পক্ষে প্রকিউর্মেন্টের কাজ করা কিছুই সম্ভব হবে না। তাঁর বক্তব্য,

> "জগতটাই যদি অসৎ হয়, তাহলে আমি একলা সৎ হয়ে কি করব।"[৪]

পবিত্র অগত্যা অনিল, গোপিনাথ, গণেশ, গোবিন্দ প্রমুখ তার অধঃস্তন কর্মচারীদের নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং চালানের জন্য হাটে আনা প্রচুর পরিমাণ ধান আটক করে।

> "সমস্ত কেনা বেচা বন্ধ হয়ে যায়। ওরা যেন অভিশাপের মতো এসে পড়েছে। কেউ গালাগাল দেয়, কেউ সমর্থন করে; আর যাদের চাল পবিত্রদের হাতে গেল তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। চোখে ওদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, মনোভাব দোলায়মান।"[৫]

পবিত্র জনগণকে যতই বোঝাতে চায় যে তারা এভাবে তাদের উৎপাদিত ধান বাইরে চালান দিয়ে আখেরি নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে, ক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত জনতা কিছুতেই তা বুঝতে চায় না। এমন কি, উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কেউই ধান চালানের ব্যপারে সাক্ষ্য দিতে চায় না। পবিত্র সরকারের নির্ধারিত পরিমাণের থেকে অনেক বেশি ধান বাজেয়াপ্ত করলেও অবশেষে প্রমাণাভাবে পবিত্রকে সেই ধান ফেরত দিয়ে দিতে হয়। সরষের মধ্যে ভূত থাকার কারণেই যে এই সব দুর্নীতি রমরমিয়ে চলতে পেরেছিল এই সব ঘটনাই তার প্রমাণ।

শ্যামসুন্দর ইউনাইটেড মার্কেন্টাইল অফিসার ও মহকুমাপতির সঙ্গে শলা করে পবিত্র সেনকে সরানোর জন্য। আর পবিত্র সেন তথা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ ক্ষেপে যাওয়ায় প্রশাসকের লোকও নির্বাচনের আগেভাগে পবিত্রকে সেখান থেকে সরাতে তৎপর হয়ে ওঠে। জনগণের স্বাক্ষরসম্বলিত একটি চিঠি মন্ত্রীর কাছে গেলে তিনি সেই চিঠি অনুমোদন করে মেদিনীপুরের এআরসিপির কাছে পাঠালে পবিত্র সেনের বদলির অর্ডার বেরিয়ে যায়।

তবে তার বদলির আগেই চালানিদের শেষ বার আটকাতে গিয়ে প্রবল জনবিক্ষোভে পবিত্রের প্রাণ সংশয় ঘটে, সে ব্যপকভাবে আহত হয়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়, দেখলেই মনে হয় আশা নেই। আসলে সরকার যে নিজের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই নানান রকম আইন করে ও প্রয়োজন মতো ফাঁক রেখে দেয় এবং পুলিশ-প্রশাসনের কাজও যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার না করে শুধু সরকারের স্বার্থকেই সংরক্ষণ করা এ বিষয়টি সৎ, কর্তব্যপরায়ণ পেট্রল অফিসার পবিত্র সেন বুঝতে পারেনি বলেই তার এই শোচনীয় দুর্গতি হল। ঔপন্যাসিক চমৎকার কূটাভাসের ছলে লিখেছেন,

> "ডাক্তারগণ নানাপ্রকার হইয়া থাকে। শুনিতে বেদনাদায়ক হইলেও সত্য যে, কোনো কোনো ডাক্তার রোগ সারাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু যে জন্য রোগ হয় সেই কারণগুলি নির্মূল করেন না; তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যত আয়ের পথ নিষ্কণ্টক হয় না; কিন্তু কখনও কখনও তাহার প্রদত্ত ঔষধগুলি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। শরীরের জীবনীশক্তিকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা এমন ভাবে জাগাইয়া তোলে যাহা রোগের কারণটিকে ঘা দিতে উদ্যত হয়। তখন ডাক্তার স্বহস্তে সেই জীবনীশক্তিকে ঘা দিতে উদ্যত হন। এই গল্পের নায়ক পবিত্র সেন ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই; তাই সে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।"[৬]

আমাদের দেশে এমনই ঘটে থাকে!

বস্তুত, সমগ্র মেদিনীপুর জেলাসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিতেই মানুষ ধান চালানির ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এই উপন্যাসে এই কালপর্বের ভয়াবহ বর্ণনা মেলে।

> "... সমস্ত দেশটা ঘর ছেড়ে রাস্তার উপর বেরিয়ে পড়ল। জেলে মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে থলে মাথায় করলে। নাপিত দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলে। ছোট ছোট ছেলেরা পাঠশালায় গেল না। লোকে মজুর চাইলে পায় না। ... কামার বেরিয়ে পড়েছে। কুমোরের চাকা বন্ধ। এদিকে বিধবা বয়স্কা মেয়েরা বেরোল, ওরা চিরকালই বেরোয়। তারপর বউড়ীরা। ... তারপর ঝীউড়ী, ... প্রথম পাঁচ জন, তারপর পনের-কুড়ি; তারপর দলেরই বা কি দরকার, পাঁচ শ', সাত শ', হাজার – রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত যাতায়াত করছে। সকাল নেই, বিকেল নেই, যেন তীর্থযাত্রী। ... চলার ভঙ্গি দ্রুত দুলকি চালের। মাথায় হাত না দিয়েই বস্তা মাথায় দু হাত দোলাতে দোলাতে ছুটতে পারে। ... প্রধান প্রধান পথে সরকারী টহলদার বসে। কারও কারও সর্বনাশ হয়, কেউ কেউ আহত হয়, কোনো স্ত্রীলোকের শ্লিলতাহানি হয়; তবু সমুদ্রের এই বুদবুদ কতটুকু? এর তরঙ্গ রোধ করা কি সম্ভব! ... আটকে পড়ে স্রোত ফুলে উঠতে থাকে। তারপর সেটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। কেউ কেউ মদ খেয়ে টং হয়ে রয়েছে বলছে, 'শালা, কে আসবে আসুক দিকি, মাথা ফাটিয়ে দুব নি', কেউ কেউ লাঠি হাতে নিয়ে তৈরী 'কার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে দেখি, ও সব বন্দুক ফন্দুক মানি নি, নল ভেঙে মুচড়ে দুব হ্যাঁ।"[৭]

তবে গুণময় তাঁর অপরাপর বহু উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও সংশ্লিষ্ট সংকটের প্রেক্ষাপটে অবক্ষয়িত মানবতার তথা ক্ষয়ীষ্ণু মানবিক মূল্যবোধের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিত্রিত করেছেন। যুগের অবক্ষয়ের সাথে সাথে যে সততা, আদর্শনিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধগুলি ক্রমশ বিনষ্ট হচ্ছে এই উপন্যাসের একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে সে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পেট্রল অফিসার পবিত্র সেন মানুষের ভাল করতে গিয়ে জনগণের কাছেই শত্রুতে পরিণত হয়েছে; এমনকি, তার কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা তার অধীনস্থ সহকর্মীদেরও তার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। মানুষের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত পবিত্র তাই আক্ষেপ করে তার ঊর্ধ্বতন অফিসারকে বলেছে,

> "সুরেশবাবু, আমাদের মধ্যে কি একটা মানুষ নাই যাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে? ছিঃ মানুষের এতই অধঃপতন হয়েছে!"[৮]

> "আমি যদি ভাল হয়ে উঠি তাহলে কি করব জান? আমি ডাকাত হব। লক্ষ্য করব কে কোথায় বেড়ে উঠছে, তাকে
> বাড়তে দেব। ছদ্মবেশে তার হিতাকাঙ্ক্ষি সেজে তাকে বাড়বার জন্য উৎসাহও দেব। তারপর তাক মতো চালাব ছুরি। সব ভেঙে ফেলব আমি, সব লুঠ করে আনব। এছাড়া আর আমি বাঁচতেও পারিনে।"[৯]

-- মানুষের হৃদয়হীনতা, অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্রপরায়ণতা যে একজন সৎ, চরিত্রবান মানুষকেও ভেতরে ভেতরে কতখানি পালটে দিতে পারে তার আভাস মেলে মুমূর্ষু পবিত্রের এই উক্তিতে। আসলে পবিত্রের কাছে আদর্শের তেমন কোনো বালাই ছিল না, তবে সে যে কাজ করত তা সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে করত। আজ পবিত্রের সেই সব শক্তি ভেঙে গেছে বলেই সে আজ এত বিপন্ন। তার কাছে চাকরি শুধু চাকরি ছিল না। সে বলে, কেবল চাকরির জন্য যে মানুষ কি করে চাকরি করে তা সে ভেবে পায় না। তার প্রশ্ন "যারা আমার সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারত তারা এটা লাগালে না কেন?" মানবসম্পদের এই অপচয়কে ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না কখনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি পবিত্রের জবানিতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন যে, রাষ্ট্র কেন তার মানবসম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র মুকুল। মুকুলের "ডাগর ডাগর চোখ, অবিন্যস্ত চুল, বয়স ... তেইশ পেরিয়ে চব্বিশে পড়েছে। মুকুল খায় না অর্থাৎ খেতে পায় না কিন্তু অনাহারের চিহ্ন কোথায় ওর দেহে? ...ও নিজেকে যত নিগ্রহ করতে চায় ততই ওর শরীর ওকে ঠকায়।"[১০]

মুকুল সন্তানসম্ভবা হওয়ার পরই তার স্বামী মারা গেলে কাজের সন্ধানে সে শ্যামসুন্দরের বাড়ি গেলে শ্যামসুন্দর তাকে ভোগ করে এবং তার অবৈধ ধান চালানের কারবারে লাগিয়ে দেয়। অবশেষে শারীরিক পরিশ্রমে এবং নানান মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে তার গর্ভস্রাব হয়ে যায়। লুব্ধ মানুষের ষড়যন্ত্রে তার জীবন বিকশিত হয়ে ওঠার আগেই অকালে ঝরে যায়, তার জননী সত্তারও অপমৃত্যু ঘটে। কন্ট্রোলব্যবস্থার ছত্রছায়ায় যে দুর্নীতির ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, মুকুল তার উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিজের জীবনকে পল্লবিত করতে চেয়েছিল কিন্তু যেহেতু আবর্জনা কেউ পছন্দ করে না, সেহেতু আবর্জনা পরিষ্কার করার সময় সেও বিনষ্ট হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে কন্ট্রোলব্যবস্থার বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি তারাশংকরের 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসেও উঠে এসেছে জীবন ডাক্তারের সাথে শশী কম্পাউন্ডারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। শশীর কথা থেকে আমরা জানতে পারি, কন্ট্রোলের বাজারে সে সময় এক জেলার চাল অন্য জেলায় যাওয়ার জো ছিল না এবং সাধারণ মানুষকে চড়া দামে বাজার থেকে চাল কিনতে হত। সে স্পষ্টই বলেছে,

> "চোরের রাজ্য বুঝেছেন, সব চোর। আপাদমস্তক চোর। রাজা চোর, রানী চোর, কোটাল চোর, সব চোর। আমি চোর, তুমি চোর—সব চোর। চালের দর ষোল টাকা? তাও এ জেলায় ষোল তো ও জেলায় ছাব্বিশ, আর দুপা ছাড়াও ছত্রিশ—আর এক পা ওদিকে চল্লিশ।"[১১]

যাই হোক, নানাবিধ জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি মানুষের বিপন্নতার কথা ফুটিয়ে তুলে গুণময় শেষ পর্যন্ত বিপন্ন মানবতারই কথাকার হয়ে থেকে গেছেন। সরকারের এই ধরনের নানান গাফিলতির কারণেই যে, স্বাধীনতার পরও জাতীয় পুনর্গঠন তথা মানবসভ্যতার বিকাশের কাজ কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা লাভ করতে পারেনি, এই উপন্যাস সেই সত্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা দেখব এই খাদ্য সমস্যাই ষাটের দশকে বিরাট আকার ধারণ করে ভয়াবহ খাদ্য আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় যেন সেই অনাগত ভবিষ্যতেরই পদধ্বনি শুনতে পাই আমরা।

তথ্যসূত্র :

১. মান্না, গুণময়, জননী, পরিশিষ্ট, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬২, পৃ. ১১০
২. ঐ

৩. মান্না, গুণময়, জননী, ৪, বেঙ্গল পাব্লিসার্স, প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬২, পৃ।. ১৯

৪. ঐ, পৃ. ৩৯

৫. ঐ, ৬, পৃ. ২৪

৬. ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ১১০

৭. ঐ, পৃ. ৮৬-৮৭

৮. ঐ, পৃ. ৪০

৯. ঐ, পৃ. ১০৪

১০. ঐ, ১, পৃ. ১

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, তারাশংকর রচনাবলী, দশম খণ্ড, আরোগ্যনিকেতন, পরিচ্ছেদ ১৬, মিত্র ও ঘোষ, পাব্লিশার্স প্রথম প্রকাশ ১৩৬০, পৃ. ১১৮

গ্রন্থপঞ্জী :

১. গুণময় মান্না. জননী. বেঙ্গল পাব্লিশার্স. প্রথম সংস্করণ. আষাঢ় ১৩৬২.

২. বিশেষ সংখ্যা : গুণময় মান্না, এবং মুশায়েরা, শারদীয় ১৪১৭.

৩. স্বপন মৈত্র. স্বাধীনোত্তর খাদ্য আন্দোলন ও তৎকালিন রাজনীতি. প্রথমা প্রকাশন. প্রথম সংস্করণ.

৪. ডঃ সত্যবতি গিরি ও ডঃ সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত. প্রবন্ধসঞ্চয়ন. দ্বিতীয় খণ্ড. রত্নাবলি. তৃতীয় সংস্করণ. জুলাই ২০১৩.

৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালিন বাংলা কথাসাহিত্য. দেজ্. দ্বিতীয় সং. জুন ২০০০.

৬. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়. তারাশংকর রচনাবলী. দশম খণ্ড. আরোগ্যনিকেতন. মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স. প্রথম প্রকাশ ১৩৬০